মূলপাতা

আমার স্বামীর ডায়েরি

Anika Tuba

October 4, 2016

28 MIN READ

১

সকাল থেকে মন ভালো লাগছে না, ইউসুফের সাথে আজ ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হলেও ছেলেরা কী সুন্দর কাজেকর্মে লেগে যায়! অথচ আমার তো কিছুতেই মন বসে না। অবাক লাগে! একটা মানুষ কীভাবে এতো ঝটপট সব ভুলে কাজে লেগে যায়! ওর তো ঝগড়া করেও কোনো ক্ষতি নেই, কী চমৎকার গটগট করে অফিসে চলে গেল। এদিক আমার বারোটা বাজে। রান্নায় মন বসল না, বান্ধবী ঘুরতে যাওয়ার জন্য ডাকল তাও যেতে ইচ্ছা হল না, চুলার রান্নাটা অন্যমনস্কতায় পুড়ে ছাই হল।

কিন্তু কাজের কাজ একটা হয়েছে বৈকি! রাগ ভুলতে ঘর গোছাতে শুরু করেছিলাম। অনেকদিনের পুরোনো ড্রয়ারটা দেখে ভাবলাম গুছাই। কখনও এটায় হাত দেওয়া হয় না। ভেতরে রাজ্যের ফেলনা জিনিস, মাকড়সার জাল, আর ধুলো-ময়লা জমে টাল পড়ে আছে। গোছাতে গিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে একটা ডায়েরি পেয়ে গেলাম—ইউসুফের ডায়েরি! বাহ! ইউসুফ ডায়েরি লেখে কখনও বলেনি তো! ভেতরে অজস্র গুটি গুটি লেখা। প্রায় পুরোটা ডায়েরি ভরা লেখাতে। জানি অন্যের ব্যক্তিগত লেখা এভাবে পড়া অন্যায় কাজ কিন্তু কৌতূহলে আমার মন ভরে গেল! কিছুক্ষণ দোমনা-দোটনা করে শেষপর্যন্ত কৌতূহলের কাছেই হার মানলাম।

কয়েকপাতা উল্টেই বুঝলাম, এই ডায়েরি লেখা হয়েছে আমাদের বিয়ের প্রায় দেড় বছর আগে। ২০১২ তেই বেশিরভাগ লেখা, শেষ হয়েছে ২০১৩ তে। কী লেখা আছে এখানে? কোথায় গেল আমার ঘর গোছানো! কোথায় রান্না! ডায়েরিতে মুখ গুঁজে বসে গেলাম। আজই আমি ডায়েরিটা পড়ে শেষ করতে চাই.

২৩ জানুয়ারি ২০১২

ভার্সিটি শুরু করেছি প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি কখনোই আমার অতোটা ভালো লাগে নি। জীবনে নারী বলেও কেউ নেই। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে আমি, বাবা রিটায়ার্ডহয়ে যাওয়ার পর থেকে পারিবারিক একটা চাপ তো আছেই। নিজেকে বরাবর খুব অথর্ব মনে হয়, সংসারের দায়দায়িত্ব তেমন কিছুই নিতে পারছি না। একসাথে টিউশন আর লেখাপড়া করে ঠিকমতো নিজের খরচ জোগাতেই কোমর ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। দু-একজন কাছের বন্ধু ক্লাস-পড়াশোনা-পরীক্ষা আর টিউশনি নিয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন চলছিল একরকম। এর বেশি মাতামাতি করার সামর্থ্যও নেই, ইচ্ছাও নেই। ক্লাসের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব সবাই এখন গার্লফ্রেন্ড সাথে নিয়ে ঘুরে, একজন অতিরিক্ত নারীর বিলাসিতা আমার জীবনে এখন নেই বলেই আমি মেনে নিয়েছি। তাই ওদিকে কখনও নজর দেই নি। মনের মধ্যে কারো ভাবনা এলেও দূরে ঠেলে সরিয়েছি। বার বার নিজের মনকে শাসন করেছি।

কিন্তু তবুও সব এলোমেলো হয়ে গেল। ঝড়ের মতো দু'টি চোখ এসে তছনছ করে দিল সবকিছু—আমার এতোদিনের চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা, লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ততা, পরিবার নিয়ে দুর্ভাবনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ সব নিমিষেই কোথায় যেন মিশে গেল। তার বদলে শরীরে ভর করল অদ্ভুত এক মাদকতা! এই মাদকতার স্বাদ আমি কোনোদিন পাই নি। যেন বসন্তের হাওয়া আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে, যেন দূরে কোথাও থেকে একটা সুর এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে, যেন সমুদ্রের অতল গহ্বরে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, ডুবছি, ডুবছি, চিরদিনের মতো—এই ডোবার কোনো শেষ নেই।

ইমা। সেই স্বপ্নের রাজকন্যার নাম।

২৬ জানুয়ারি ২০১২

কী হল? কেন হল? কীভাবে হল? কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজেকে যুক্তিবাদী বলেই সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু আজ আমার সব বোধবুদ্ধি থমকে গেছে।

আচ্ছা, একটু শুরু থেকেই বলি। স্কুল-কলেজে প্রেম করা তো দূরের কথা, গত তিন বছরের ভার্সিটি জীবনেও ক্লাসের কোনো মেয়েকেই আমি তেমন পাত্তা দেই নি। পড়ায় আমার কারো সাহায্য নেওয়ার দরকার হতো না। উল্টো আমার কাছেই সবাই পড়া বুঝতে চাইত, নোট নিতে আসত। পার্টি, শিক্ষাসফর জাতীয় ইভেন্টগুলোয় ক্লাসের মেয়েদের সাথে টুকটাক কথা হয়েছে--মেয়েদের সাথে আমার বন্ধুত্ব বলতে গেলে এ পর্যন্তই। মাঝেসাঝে ক্যাম্পাসের মাঠে আড্ডার সময় বন্ধুদের 'গার্লফ্রেন্ড'রাও আসত। কী সব ন্যাকা ন্যাকা মেয়ে বাবা! হয়ত বয়ফ্রেন্ডরা সামনে থাকত বলেই ন্যাকামিটা যেন আরেকটু বেড়ে যেত। এই ধরণের মেয়েকে আমি কখনোই মন থেকে পছন্দ করতে পারিনা। কিন্তু ইমা! আমার হৃদয়ের রাণী ইমা! ও সবার থেকে সত্যিই আলাদা! ওর হয়তো এই ভার্সিটিতে পড়ার কথাই ছিল না! বিদেশের ভার্সিটিতে পড়ত। বাবা বিশাল বড়োলোক। দু'বছর আগে ওর মা খুব অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকা চলে যায় ওরা। এরপর ওখানেই পড়াশোনা শুরু করে ইমা। কিন্তু মা মারা যাবার পর ব্যবসার কাজে দেশে ফিরতে হয় ওর বাবাকে। আর একমাত্র মেয়েকে চোখের আড়ালে রেখে উনি কোনোমতেই ফিরতে রাজি না। তাই ইমা ক্রেডিট ট্রান্সফার করে এই ভার্সিটির শেষ বর্ষে ভর্তি হলো। আর একেবারে আমার ডিপার্টমেন্টেই এসে পড়লো!

এমনও কি হয়?!

গল্প-সিনেমায় হলেও একটা কথা ছিল। আমি ভাবতেও পারিনা ইমা আমার ক্লাসের একজন! অন্য সব মেয়ের থেকে ও একদম ভিন্ন। যেন অসংখ্য ঘাসফুলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটি সদ্য ফোটা লাল গোলাপ। ওর তাকানো, ওর কথাবার্তা, ওর চালচলন, পোশাক-আষাক সবকিছুতেই স্পষ্ট একটা রুচির ছাপ। বড়লোকি উগ্রতা নেই, নেই মধ্যবিত্ত কুণ্ঠিত ভাব, আর গরিবের সাথে তো ওর তুলনাই চলে না। ও যখন কথা বলে তখন সবাই তাকিয়ে থাকে, ক্লাসের ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও ওর নামে বাজে কথা বলতে ভয় পায়, সবাই যেন সমীহ করে চলে ওকে। কখনও এই ভার্সিটিতে ক্লাস করে নি, কিন্তু হঠাৎ এসেও সবার সাথে মিশে গেল দু'দিনেই। ক্লাসের সবচেয়ে প্রাণোচ্ছ্বল মানুষটি ইমা, ইমাকে ছাড়া এখন সি-সেকশন কল্পনাই করা যায় না। একদিন ক্লাসে আসেনি, ওমনি সবাই ওর জন্য অস্থির হয়ে গেল! এমনকি স্যাররা পর্যন্ত ওর খোঁজ করছিল। ইমা! কেমন একটা আবেশ ছড়িয়ে রাখে ওর চারপাশে, ফুলের মিষ্টি সুবাসের মতো, ও থাকলে আনন্দ, আর না থাকলে সেই শূন্যস্থান পূরণের কেউ থাকে না।

২৭ জানুয়ারি, ২০১২

এখনও ইমার সাথে সামনা-সামনি কোনো কথা হয় নি। কিন্তু ঐ দুটো চোখে চোখ পড়েছে। পাগলের মতো সেদিন সবকিছু ভুলে গেছি। ক্লাসের পড়া পারিনি, স্যারের রোল কলে সাড়া দেই নি, পরীক্ষার মাঝখানে খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেছি। রাতে গায়ে জ্বর উঠেছে। উত্তেজনা থেকেই কি এমনটা হচ্ছে?

কোনো মেয়েকে এতো তীক্ষ্ণ আর গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে দেখি নি। যেন একবার তাকিয়েই আমার ভেতরের সব খবর জেনে যাচ্ছিল ইমা!

ইমা! কোনো কথা হয়নি ঠিকই, তবু যেন চোখে চোখে একটা সেতুবন্ধন হয়ে গেল। যেন ইশারায় বলে দিল সেও আমাকে পছন্দ করে। ক্লাসের সব ছেলের আরাধ্য ইমা কি সত্যি আমাকে চায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমায় কে দেবে! ওহ, আমি পাগল হয়ে যাব!

২৯ জানুয়ারি, ২০১২

আজকের দিনটি আমার স্মৃতিতে সেরা দিন হয়ে থাকবে। আজকে প্রথমবারের মত ইমার সাথে আমার কথা হয়েছে।

ইমার সাথে কীভাবে কথা বলব, কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ছেবলা ছেলেদের মতো পিছে পিছে ঘুরে মেয়ে-পটানোতে আমি অভ্যস্ত নই। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখার যুগও শেষ।

একদম হঠাৎ করেই একটা সুযোগ এসে গেল। কোনোদিন যা করিনি, অনিকের চাপাচাপিতে আজ তাই করলাম দুজনে মিলে গেলাম জন্মদিনের দাওয়াতে। ক্লাসেরই কোন মেয়ের যেন জন্মদিন পার্টি। এসব পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাও আবার মেয়েদের বাসায় গিয়ে! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি, পৃথিবী, স্রষ্টা সবাই চায় আমাদের দেখা হোক, কথা হোক, ভালোবাসা হোক। তাই অনিকের অনুরোধ আর ফেলতে পারলাম না। তখনও জানতাম না যে ইমাও সেখানে আসবে।

ক্লাসের পড়াশোনা পারি দেখে আমার একটা আলাদা দাপট আছে। সবাই বেশ ভাব করতে চায় আমার সাথে। কিন্তু পার্টিতে আমি একেবারেই আনাড়ি! এক কোণায় চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ একটা ডাক শুনে চমকে উঠলাম। ইমা!

- এই যে শুনছেন, এখানে একা বসে আছেন কেন?

- এইতো মানে ... কী বলব বুঝে না পেয়ে বিব্রত একটা হাসি দিলাম আমি! নিশ্চয়ই আমাকে খুব বোকার মত দেখাচ্ছিল!

ইমা বোধ হয় বুঝতে পারল। অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, “চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি, আশা করি আমার সঙ্গ খারাপ লাগবে না”।

ইমার পেছন পেছন মন্ত্রমুগ্ধের মত হেঁটে বারান্দায় গেলাম। কত কথা হল ওর সাথে! যেন হাজার বছরের পরিচয়।

ইমা খুব মিশুক মেয়ে, একদিনের পরিচয়েই অবলীলায় নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা, ভালো-মন্দ সব দিকের কথা বলে দিল। ওদের এতো সম্পদ নিয়ে ওর কোনো বড়াই নেই, দেবীর মতো ঝলসানো রূপ কিন্তু সেই সুন্দর মুখে কোনো অহংকার নেই। আমিও গড়বড় করে অনেক কথাই বললাম। আমার গ্রামের পরিবারের কথা, ছোটো বোনের কথা, জীবন নিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা।

আমি প্রেমে বিশ্বাসী না শুনে ইমা তো হেসেই খুন! বলে কিনা আমি নারীজাতিকে ভয় পাই। আসলে ভয় না, বললাম, আমার কাঁধের সব দায়িত্ব শেষ না করে কোনোভাবেই নতুন সম্পর্কেজড়াতে রাজি নই।

ইমা একথা শুনে অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। এরপর মৃদুস্বরে বলল, “আপনি সত্যি অন্যরকম, অনেক বেশি দায়িত্ববান”।

২

সেই ছিল শুরু। ইমার সাথে এভাবেই তাহলে ইউসুফের দেখা হয়। ইমার কথা কখনই আমাকে কিছু বলে নি ইউসুফ। ঊনত্রিশ জানুয়ারির পর আরও আছে ওর অসংখ্য লেখা, সেখানে ইমার খুঁটিনাটি বিবরণ। পড়তে পড়তে মেয়েটাকে যেন চিনে ফেলেছি, এখন সামনে দেখলেই চিনে ফেলব।

জানুয়ারি থেকে শুরু করে প্রতি মাসেই পনেরো-বিশটা করে লেখা। মে মাস পর্যন্ত পড়তে পেরেছি। ইমার সাথে ইউসুফের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল, ওদের সম্পর্ক‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’তে নামল। ওরা প্রায়ই বাইরে ঘুরতে বেরোত। উপহার আদান-প্রদানও হত! ইমার দেওয়ার হাতই বেশি লম্বা ছিল বোঝা যায়। ইউসুফকে এক বসায় দশ সেট শার্ট কিনে দিত। কিন্তু ইউসুফকে খারাপ লাগতে দিত না। নার্সারি ঘুরতে গিয়ে সেখান থেকে ইউসুফের টাকায় নিজের জন্য হয়তো পাঁচটা গাছ কিনে নিত। দু’জন মিলে অ্যাডভেঞ্চারও কম করে নি! ঢাকার বাইরেও আরও অনেক জায়গায় গেছে দুইজন! বিয়ের আগেই এত কিছু!

পড়তে পড়তে আমি কখনও কাঁদছি, কখনও ইমার স্থানে নিজেকেই রেখে কল্পনা করছি। আমার সঙ্গে ঘোরার জন্য ইউসুফের এত সময় নেই। অথচ ও এতটা রোমান্টিক! এতটা অন্তরঙ্গ সম্পর্কছিল একটা মেয়ের সাথে!

কিন্তু কী হয়েছিল তারপর? কেন ইমার সাথে বিয়ে হল না? ইমা খুব বড়লোকের মেয়ে বলেই কি ওর পরিবার রাজি হয় নি? খুব জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ইউসুফের আসার সময় হয়ে যাওয়ায় আজ আর পড়তে পারব না। আবার আগামীকালের অপেক্ষা! এই অপেক্ষার প্রহর বড্ড কঠিন লাগছে...।

খাবার টেবিলেও আজকে ইউসুফের সাথে কথা বলি নি। এমনকি ও বাসায় ঢুকে যখন সালাম দিল, আমার উত্তরটা দিতে খুব কষ্ট হয়েছিল। সাধারণত ঝগড়া হলেও সালাম-খাবার এসব নিয়ে আমি এমন করি না। সালাম দিলে উত্তর দিই, খাবার সময় এটা-সেটা এগিয়ে দিই। বলতে গেলে এভাবেই আমার রাগ অর্ধেকটা পড়ে যায়। কিন্তু আজ ইমার কথা পড়ে এত রাগ আর হিংসা হচ্ছে যে, কিছুই করতে মন টানছে না। থাকুক ও নিজের মতো। পুড়ে যাওয়া তরকারি দিয়েই ইউসুফ নিঃশব্দে খেয়ে গেল। কোনো অভিযোগ ও আমার রান্নার কখনোই করে না, আজও করল না। কিন্তু তবু আজ ওর প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতাও এলো না আমার। যদিও বুঝতে পারছি, যা ঘটেছে বিয়ের আগেই সবকিছু। কিন্তু তারপরও একটা অবুঝ আক্রোশে আমার মন ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটা লম্পট, ধোঁকাবাজের সাথে সংসার করছি।

রাতে শোওয়ার সময় ও আমার রাগ ভাঙাতে এসেছিল,

“বউ, তোমার এতো অভিমান কেন? এখনও কথা বলবে না?”

আমি কোনো কথার জবাব দিই নি। কী জবাব দেব? আমার মন যে দাউদাউ করে জ্বলছে! ডায়েরি পুরোটা শেষ না করার আগ পর্যন্ত আমার অন্তরের আগুন বোধ হয় আর নিভবে না। সাড়াশব্দ না পেয়ে একসময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। আর আমি বিছানায় ছটফট করে এদিক-ওদিক করতে লাগলাম।

৩

পরদিন ইউসুফ বাসা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আমি ডায়েরি নিয়ে বসেছি। পুরোটা আজ শেষ করেই ছাড়ব..।

১২ এপ্রিল ২০১২

ছয় মাসে কি একটা মানুষকে চেনা যায়? কিন্তু আমার মনে হয় ছয় মাস কেন, ইমাকে বুঝতে আমার তিন দিনও লাগেনি। এতো কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা যে, ইমা আমার জন্য সব করতে রাজি, সব ছাড়তে রাজি। মানুষ মানুষকে কতোটা ভালোবাসে, আদৌ ভালোবাসে কিনা সেটা জানা যায় তার ত্যাগ দেখে। ইমা এতো বড়োলোকের মেয়ে হয়েও আমার জন্য সেই জীবন ছাড়তে ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ওর বাবার সাথেও কয়েকবার আমার কথা বলে ফেলেছে।

খুব দুশ্চিন্তা হতো আমার ইমাকে নিয়ে। সামাজিক স্ট্যাটাসের দিক থেকে এত দূরত্ব আমাদের, কীভাবে বিয়ে হবে? কিন্তু ইমা আমাকে আশ্বস্ত করে বলে, সব হয়ে যাবে। ওর বাবার একমাত্র সন্তান ও, বাবা ওর কথা ফেলবেন না। ইমার কথায় আমি ভরসা খুঁজে পাই, কারণ জানি, ইমা বাজে কথা বলার মেয়ে না। ও যা বলবে তা করেই ছাড়বে।

ইমাকে যদি আমি ডাকি এক ডাকে ও আমার বিছানায় আসতে রাজি হবে। শরীর দেখানো মেয়ে ও না, কিন্তু আমার জন্য ও সব করতে পারে সেজন্যই আসবে। আমাকে স্বামী হিসেবেই ও মনে মনে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এসব করতে আমার বিবেকে বাধে। সতীত্বের দাম নিশ্চয়ই আছে। আর ইমার দায়িত্ব না নিয়ে ওকে ভোগ করা স্বার্থপরতার শামিল।

তবু আজকের মতোই কত রাত ওকে একটু কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট করি! এ কথা কী ইমা বোঝে? নিশ্চয়ই বোঝে।

২১ এপ্রিল ২০১২

গত কয়েকদিন লিখতে পারিনি। ডায়েরি লেখা আরম্ভ করার পর এই প্রথম এতদিন গ্যাপ গেল। প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। শরীর অবসন্ন, দুর্বল হতে হতে বিছানা থেকে নামার মত অবস্থাও ছিল না। হল থেকে বেরোতে পারিনা, তাই ইমার সাথেও দেখা হল না প্রায় দশ দিন! বাড়িতে সময়মত টাকা পাঠানো গেল না। একটা ক্লাসটেস্ট মিস হয়ে গেল।

খারাপের মধ্যে ভালো একটাই, একটা অসাধারণ ছেলের দেখা পেলাম! আমাদেরই ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু অন্য সেকশনে পড়ায় আগে ওর সাথে তেমন আলাপ হয় নি। মাঝেমধ্যে পড়া বুঝতে ঘরে আসত, একসাথে কয়েকজনের সাথে আসত বলে আলাদা করে কথা হয় নি। শুধু নামটা জানি—রেহান। পরিচয় বলতে এতটুকুই। কিন্তু আমার শরীর খারাপ শুনে 'ইউসুফ ভাই, ইউসুফ ভাই' করে দৌড়ে এসেছে! কিছু মানুষের আন্তরিকতা একদম ভেতর থেকে আসে বোঝা যায়। এই ছেলেরও তেমন। ঠিকমতো ওর নামটাও আমার মনে ছিল না, অথচ কী সেবাটাই না করল আমার।

দিনে-রাতে আমার খোঁজখবর নেওয়া, নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওষুধ-পত্র কেনা, খাবার-দাবার ঠিকমত খাচ্ছি কিনা সেদিকে নজর রাখা। এক ঝুড়ি ফলও কিনে মাথার কাছে টেবিলটায় রেখে দিয়েছিল, যদি কিছু খেতে ইচ্ছা করে! অথচ রেহানও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে, তারও হাতখরচ নিয়ে টানাটানি। তবু কত করল! আসলে মানুষের মনটাই ব্যাপার। এই ছেলের হাতে টাকা থাকলে আরও করত। যা করেছে সেটাই কজনা করে! সুস্থ হওয়ার পর ওর চেহারায় যে হাসিটা ছিল, একদম অকৃত্রিম! সেদিনই বাইরে নিয়ে আমাকে বিরিয়ানি খাওয়ালো, জোর করে দুজনের বিল মেটালো। এরপর হাত ধরে বলল, "ভাই, আমাদের একটা আড্ডায় আসেন, দ্বীন ইসলামের কথাবার্তা হয়, আপনি আসলে খুব খুশি হব"।

ধর্মীয় দিকটা নিয়ে আমি কখনও ভাবার তেমন সুযোগ পাই নি। সে অবসরই হয়নি আমার। কিন্তু রেহানের কথাটা ফেলতে পারলাম না, তাই বললাম যাব।

কিন্তু যাবো বলেও বিপাকে পড়েছি। এই ধরণের আড্ডায় কখনও যাই নি, যেতে মোটেও ইচ্ছা হচ্ছে না। এখন আবার অজুহাত খুঁজতে হবে, কেন যাই নি। ভাবছি আগামী কয়েকদিন রেহানকে একটু এড়িয়ে চলতে হবে। কেন যে অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে যাই! ভদ্রভাবে বলে দিলেই পারতাম, ভাই এসবে আমার আগ্রহ নেই। এরচেয়ে একটা বিকাল ইমার সাথে কাটানোও অনেক চমৎকার! আহ, কতদিন ইমার মুখটা দেখিনা! পাখির নীড়ের মতো সেই দুটো চোখ...

২২ এপ্রিল ২০১২

ঠিক দশদিন পর আজ ইমার সাথে দেখা। আমার জ্বরে-ভুগে-ওঠা ফ্যাকাসে চেহারার চেয়েও ওর মুখটা বেশি ফ্যাকাসে হয়ে ছিল। গত দশদিন যে ওর নাওয়া-খাওয়া-ঘুম কোনোটাই হয় নি, সেটা ও না বললেও বুঝতে পারছিলাম। এত মায়া লাগে ইমার জন্য! ইশ! আমি কি এত ভালোবাসার যোগ্য? আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় ইমা আমাকে আজ বললো,

- কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না

- কথা দিলাম।

২৩ এপ্রিল ২০১২

কথা গুছিয়ে লিখতে আজ বেগ পেতে হবে। খুব উদভ্রান্ত হয়ে আছি আজ। অস্থিরতা কাজ করছে।

শনিবার বিকেলে ইমার সাথে দেখা করে এসে রুমে ঢুকেই দেখি রেহান এসে হাজির, সে আমাকে আড্ডায় নিয়ে যেতে এসেছে! আমি তো হতভম্ব! এগুলোকে এতো সিরিয়াসলি নেয় কেউ! ওকে মুখে যাব বললেও যাওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও ছিল না বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘর থেকে কাউকে বের করে তো দিতে পারিনা। অগত্যা যেতে হল।

নবী ইউসুফকে নিয়ে আলোচনা।

নবী ইউসুফের বাবাও নাকি নবী ছিলেন! জানতাম না আগে। ইউসুফ ছোটোবেলাতেই স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন শুনে বাবা বুঝলেন ইউসুফ একজন নবী হবেন। এই ছেলেই ছিল সব সন্তানের মধ্যে তাঁর চোখের মণি। ভাইয়ের প্রতি বাবার এই অতিরিক্ত ভালোবাসা অন্য ভাইদের সহ্য হল না। তারা বুদ্ধি আঁটল, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ইউসুফকে অন্ধকার কুয়ার মধ্যে। একাকী ইউসুফকে উদ্ধার করল পথের একদল যাত্রী। এরপর সে বিক্রি হয়ে গেল সুদূর মিসরে এক রাজার কাছে।

গল্পের মতো কাহিনি! আগে কখনও শুনি নি! নবী ইউসুফের সাথে জুলেখা বিবির প্রেমের গান শুনেছিলাম। ওরা বললো, এসব নাকি মিথ্যা কথা। নবীদের কেউ এমন অবৈধ প্রেম করেন নি। এমনকি জুলেখা নামটাও কোরআনে নেই! মন্ত্রী আযিযের স্ত্রী ইউসুফকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে, অবৈধ সম্পর্কের জন্য জোর-জবরদস্তি করতে থাকে। সুন্দরী নারী, মোহনীয় ডাক, কিন্তু নবী ইউসুফ! নিজেকে বাঁচাতে, নিজেকে চরিত্রকে পবিত্র রাখতে, এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে দূরে থাকতে কারাগারে যাওয়ার জন্য দু'আ চায়!

এরপর কয়েক বছরের কারাবাস শেষে ফিরে এসে রাজ্যের উঁচু পদে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মিল হয় তার পরিবারের সাথে, তার ভাই আর বাবার সাথে। ভাইদেরকে তিনি মাফ করে দেন।

কাহিনি শেষ করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চলল। আরও কয়েকজন সিনিয়র আর জুনিয়র ছাত্রও এসেছিল। প্রেম করা মারাত্মক গুনাহ—এটা নিয়েই প্রায় চল্লিশ মিনিট মতো কথা বলল। আমি খুব সংকুচিত বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই এসব বলা! অথচ ওরা কেউই ইমার কথা জানে না, জানার কথা নয়। ক্লাসের ছেলেরা ইমার জন্য আমাকে ঈর্ষা করে, কেউ কেউ তো বলেই বসে, দোস্ত, তোর ভাগ্যটা সেইরকম ভালো! শুনে মনে মনে আমার খুব গর্ব হয়! নিজেকে রাজা-রাজা মনে হয়। এটা সত্যি, ইমাকে পাওয়া মানে সত্যি সত্যিই রাজকন্যা আর রাজত্ব একসাথে পাওয়া। ইমারা প্রচণ্ড বড়োলোক, ওর বাবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ছেলের ভাগ্য রাতারাতি বদলে ফেলা দু'মিনিটের কাজ।

অথচ এই কয়টা ছেলের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা ইমার কথা জানতে পারলে আমাকে খুব খারাপ ভাববে। একজন একটা হাদীস বললো, পরনারীর গায়ে স্পর্শ করার চাইতে নাকি লোহার পেরেক দিয়ে কপালে ফুটো হয়ে যাওয়া বেশি ভালো! শুনেই আমি কুঁকড়ে-মুকড়ে গেলাম।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছিল। সঙ্কোচে সবার সামনে শেষপর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, প্রেম করা কি এতই খারাপ?

২৫ এপ্রিল ২০১২

সকালে ওঠার পর অস্থির ভাবটা দূর হয়ে গেল। মনটা হালকা খচখচ করছিল, ক্লাস শেষে ইমার সাথে আলাদা করে দেখা করলাম। ওর হাতে হাত রাখলেই আমার রাজ্যের চিন্তা দূর হয়ে যায়। ইমাকে শোনালাম নবী ইউসুফের কাহিনি, ও আগ্রহ নিয়ে শুনল। এরপর এ কথা-সে কথা করে আমরা দুজনেই অনেক কথা বললাম। খচখচে বোধটা কখন উধাও হয়ে গেল টেরই পেলাম না।

৪

- কী হল দরজা খুললে না যে? আওয়াজ শোনো নি?

পড়তে পড়তে ডায়েরির মধ্যে এতো ডুবে গিয়েছিলাম যে দরজার খটখট শব্দ কানে আসে নি। ইউসুফের গলায় চমকে চোখ বড়ো বড়ো করে ওর দিকে তাকালাম!

- তুমি! এখন?

বেলা মাত্র বারোটা বাজে, এমন অসময়ে ইউসুফকে বাসায় আসতে দেখে আমি এতো আশ্চর্য হলাম যে এটাও ভুলে গেছি ওর সাথে আমার কথা বন্ধ! সম্বিৎ ফিরে পেতে খানিকক্ষণ লাগল আমার। এরপর জিজ্ঞেস করলাম,

- এত জলদি কীভাবে আসা হল? চাবি দিয়ে লক খুললে যে? নক করতে পারো নি?

- শরীর খারাপ লাগছিল, তাই আগেভাগেই চলে এলাম। কারেন্ট নেই দেখে কলিং বেল শোনো নি, দরজায় নক করেও কেউ খুললো না, তাই...কিন্তু তোমার হাতে এটা কি! আরে আমার পুরোনো ডায়েরি! এটা তুমি কোথায় পেলে?

- তুমি যেখানে রেখেছিলে সেখানেই নিশ্চয়ই। আর কতো কাহিনি আছে তোমার জীবনে?

আমার হাতে খোলা ডায়েরি দেখে ইউসুফের মুখ থমথমে গম্ভীর হয়ে গেল। ও অসুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছে সে কথা আমার খেয়াল থাকল না, রাগে অন্ধ হয়ে ছিলাম আগে থেকেই, তার ওপর ওর কাছে ডায়েরিসহ এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় অনেকটা আত্মরক্ষার জন্যই হয়তো আমি আজেবাজে সব কথা বলে ওকে আক্রমণ করতে থাকলাম। ও চুপ করে সব শুনল। এরপর বলল, "তোমার যদি আমাকে নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে পড়ো, পুরো ডায়েরিটাই পড়ো। তারপর কথা হবে"।

আমি ডায়েরি হাতে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বিছানাপত্র সকাল থেকে অগোছালো হয়ে আছে, তাতে কি! আমি শুধু জানি, আমাকে এই কাহিনীর শেষ জানতে হবে।

ড্রয়িং রুমে বসে আবার পড়া শুরু করলাম।

এখন আর লুকিয়ে পড়ার ভয় নেই। কিন্তু পাতার পর পাতা পড়ার ধৈর্য্যও হারিয়ে ফেলেছি! রাগে তখন আমার শরীর কাঁপছে। একসাথে কয়েক পাতা উল্টাচ্ছি, এর শেষ আমার জানাই লাগবে! যত দ্রুত সম্ভব! পড়তে পড়তেই বুঝলাম বড় ভুল হয়ে গেছে.

২৯ মে ২০১২

প্রথমদিন যখন রেহানদের আড্ডায় গিয়েছিলাম তেমন ভালো লাগে নি। বিরক্তি, দ্বিধা, সংকোচ, অস্বস্তি সব মিলিয়ে একটা মিশ্র অনুভূতি কাজ করছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা শুনে মনটা কেমন খচখচ করছিল, কিন্তু কারণটা ধরতে পারছিলাম না।

কারণটা আমি এখন ধরতে পেরেছি। নিজেকে মুসলিম দাবি করে আসা এই আমি এতদিন ইসলাম নিয়ে একটুও চিন্তা করি নি। নবীজি (সা) কে বিশ্বাস করি বলেছি মুখে মুখে, কিন্তু উনার সম্পর্কেতেমন কিছুই জানতাম না,উনার শিক্ষা মেনে চলা তো দূরের কথা! প্রেম নিয়ে আল্লাহর আদেশ আমার কাজের ঠিক বিপরীত। এটাই মানতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু রেহানের সাথে আরও আলাপের পর বুঝতে পারছি আমার এতদিনের ধ্যানধারণাগুলোতেই ভুল ছিল। বিয়ের বাইরে প্রেম আসলেই গোলমেলে ব্যাপার। সবচেয়ে বড়ো কথা—আল্লাহ আর রাসূলুল্লাহ যা বলেছেন, তা একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের মানতে হবে। মেনে চলার মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত।

১৩ জুন ২০১২

আজ রেহানের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করলাম। মূলত আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এগুলো নিয়েই। আমার খুব ভয়-ভয় করছে। অন্ধকার বা ভূতের ভয় না, এটা একটা অন্যরকম ভয়! জান্নাত হারানোর ভয়, শাস্তি পাবার ভয়।

আখিরাতটা এই জীবনের তুলনায় বিশাল, অনেক বিশাল! সেই আখিরাতে যদি আমি ব্যর্থ হই, তাহলে এই মুহূর্তের জীবনের লাভ-খ্যাতি-টাকাপয়সা-ভালোবাসা কোনো কাজেই আসবে না। ব্যর্থদের দলে যুক্ত হয়ে যাব চিরদিনের জন্য। জাহান্নামের আগুনে পটপট করে আমার হাড্ডি-মাংস-চামড়া পুড়বে, ফুটবে। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবে না। কোথায় থাকবে সেদিন বাবা-

মা-ভাইবোন সবাই! কোথায় থাকবে সেদিন ইমা! ইমা কি আমাকে বাঁচাতে পারবে?

নাহ, আল্লাহর বিচারের সামনে সবাই তুচ্ছ।

৩০ জুন ২০১২

ইমার সাথে আপাতত সম্পর্কনা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অনেক সময় লেগেছে। ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না কেন আমি এরকম প্রেম করতে চাই না!

ইমা! আমি কিছু বলার আগেই যে আমাকে বুঝে ফেলত, সেই ইমা আমাকে এখন কেন বুঝতে চাইছে না?

ওকে এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব না! হে আল্লাহ! তুমিই আমার জন্য সহজ করে দাও!

৪ জুলাই ২০১২

ইমাকে ছাড়া থাকা আমার জন্যেও কী যে কঠিন! বিয়ের কথা এই মুহূর্তে চিন্তা করা মোটেই মানায় না, কিন্তু ইমাকে ছেড়ে থাকাও অসম্ভব। প্রেম করব না-করব না বলেও প্রায়ই কথা হচ্ছে আমাদের। ইমাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমার সাথে যেন কথা বলেই ছাড়বে! ওকে উপেক্ষা করা আমার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেদিনও ক্লাসের মাঝে খপ করে আমার হাত ধরেছে, মেসেজের পর মেসেজ, ফোনের পর ফোন তো আছেই। এভাবে চলতে থাকলে আমি নিজেকে কতদিন সামলে রাখতে পারব! বিয়ের পর সংসার কোনো না কোনো একভাবে চলেই যাবে, লাগলে ছোটো কোনো চাকরি করব, কিন্তু বিয়ে করাই এখন নিজেকে এই ফিতনা থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ।

বিয়ের মাধ্যমে মানুষের রিযিক বেড়ে যায়, এটা তো আল্লাহর ওয়াদা। তাহলে আমি ওকে খাওয়ানো-পরানোর ভয় কেন পাচ্ছি? ও বড়োলোকের মেয়ে বলেই কি! কিন্তু ও তো কখনো আমার কাছে অনেক জিনিসের দাবি করে নি। ছোটোখাটো একটা বাসা নিলেই আমাদের চলে যাবে, আর পড়াশোনা নাহয় নিজে নিজেই করব। আর বেশিদিন বাকিও নেই ফাইনাল পরীক্ষার। এর পরেই বিয়েটা সেরে নিলে কেমন হয়?

২৭ জুলাই ২০১২

ইমাকে আজ আমি বিয়ের কথা বলেছি। ও বিয়েতে রাজি! আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!! আমি জানতাম ও রাজি হবেই। আমার জন্য সব করতে পারে আমার ইমা, আমার আদুরে পাখি ইমা। আজ যে আমি কী খুশি লিখে বোঝানো যাবে না। ইচ্ছা করছে দুনিয়ার সবাইকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করি। চিৎকার করে জানাই, ইমা আমার! আমরা বিয়ে করছি!

রেহান আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে। আমি নিশ্চিত আমার বাবা-মায়েরও অমত হবে না। ইমার বাবাও আমার কথা জানে, তারও নাকি তেমন অমত নেই আমার ব্যাপারে।

আমার আর ইমার বিয়ে হলে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাই হবে প্রথম বিয়ে!

১৮ আগস্ট ২০১২

ইমার সাথে বিয়েটা মনে হয় না হবে। বিয়ের ব্যাপারটা সহজে মেনে নিলেও ইমা কিছুতেই নিজেকে পরিবর্তন করছে না। ওকে আমি নামাজ আর হিজাবটা অন্তত করতে বলেছিলাম, কিছু বই লেকচারও দিয়েছি। কিন্তু ওর মধ্যে কোনো বদল নেই। আগের মতোই হৈ-হুল্লোড়, সবার সাথে আড্ডা। এমনকি ক্লাসের ছেলেদের সাথেও সেই একই রকম কথা-হাসি-তামাশা। ইদানিং এগুলো সহ্য করা খুব কঠিন লাগে। আমি বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখি, ইমার সাথে কোনো রাগারাগি করি না। ইসলামকে বুঝতে

আমারই তো কতদিন লেগেছে! ইমাকেও সময় দেওয়া দরকার। যেন ও ইসলামের অর্থ বুঝতে পারে।

ইমা না বদলালে আমাদের বিয়ে হলেও টেকার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছেলেদের সাথে এভাবে গায়ে পড়ে মেশা, সবাই মিলে হ্যাং-আউট করা, পার্টিতে যাওয়া—এগুলো আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। এগুলো মেনে নিলে আমার নিজেরও গুনাহ হবে, আল্লাহর কথার অবাধ্য হতে হবে। আর যে মেয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, সে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের কী শিক্ষা দেবে?

মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবেই ইমাকে বিয়ে করে নিই। হয়তো ও আস্তে আস্তে বদলাবে। কিন্তু বিয়ের আগে এত বলার পরেও যাকে বদলাতে পারছি না, বিয়ের পর তাকে আমি কীভাবে বদলাব! হেদায়েতের মালিক তো আল্লাহ! আমাদের কাউকে বদলে ফেলার কোনো ক্ষমতাই নেই।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

একই ক্লাসে প্রতিদিন আসি, অথচ ইমার সাথে কথা হয় না অনেকদিন! শুধু দূর থেকে দেখি। তবুও একবার চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে নিই। উহ! কী যে কঠিন নিজের নজরকে হেফাজতে রাখা! বিশেষ করে ইমার সাথে! ইমার চোখে চোখ পড়া মানে বড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছ। যার দিকে একবার ইমা ইশারা করে, সে কখনও সেই দৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারে না। মোহনীয় ওর দৃষ্টি, মাতাল করে দেওয়া ওর চোখের ডাক!

আমিও অবশ্য ওর সাথে যোগাযোগ করি, তবে তা কালেভদ্রে। মাঝে মাঝেই ওকে ভালো লেখা পেলে মেসেজ করি, ইসলামি বই পাঠাই, কয়েকজন দ্বীনী বোনের সাথে পরিচিত হতেও বলেছিলাম। বোনগুলোকে আমি চিনিনা, রেহান বললো ওরা নাকি ইসলাম মেনে চলে। ওদের সাথে হয়তো ইমার কথা হয়! কে জানে! আজকে ইমার দিকে একবার চোখ পড়েছিল, দেখলাম ও স্কার্ফপরা। কী যে খুশি লাগছে! ইমা কি তাহলে ইসলামের পথে পা বাড়িয়েছে?

হে আল্লাহ, তুমি ইমাকে ইসলামের জ্ঞান আর হেদায়েত দান করো! আমি এটাই চাই..।

৫ নভেম্বর ২০১২

কিছু সত্য এত ভয়ংকর কেন? মনে হয় যেন না জানলেই ভালো হতো। অনিকের সাথে কথা বলতে গিয়ে ভয়াবহ ব্যাপার জানতে পারলাম। ইমা নাকি আমাকে বিয়ে করার জন্যই এখন স্কার্ফধরেছে! অথচ গতকালই ফোন করে অনেক কান্নাকাটি করে আমাকে বললো, ও নাকি বদলে গেছে! ইসলামের পথে পা বাড়িয়েছে!

আসলে ইমা কখনও "না" শুনে অভ্যস্ত না। বড়োলোকের মেয়ে, ছোটোবেলা থেকে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আমি এখন ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ! আমাকে ওর পাওয়া চাই। তার জন্য ও সবকিছুই করতে রাজি। ও কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি বদলে গেছি! আল্লাহকে খুশি করলেই আমি খুশি হই। ও যদি সত্যি ইসলামের দিকে মনোযোগী হতো, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় ওকে বিয়ে করতাম। কিন্তু খেলার ছলে ও ইসলামকে নিয়ে যা করছে, তার জন্য ওর প্রতি আমার সম্মান দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। ইসলাম নিয়ে মিথ্যে অভিনয় করার কোনো সার্থকতা নেই। এভাবে ইমা আমাকে কোনোদিনও পাবে না।

২১ নভেম্বর ২০১২

ইমা স্কার্ফছেড়ে দিয়েছে। হেদায়েত ব্যাপারটা নিয়ে বেশিদিন অভিনয় করা যায় না। ইদানিং ও আগের চাইতেও অনেক বেশি উগ্র পোশাক পরে আসে। হয়তো আমাকে ভোলানোর জন্য এটাও ওর একটা কৌশল! প্রায়ই অচেনা নাম্বার থেকে ফোন দেয়।

মাঝে মাঝে টেক্সট করে বলে খুব জরুরি কথা আছে, কিন্তু ফোন ধরে দেখেছি কথা আর শেষ হয় না, জরুরি কথার অজুহাতে এমন সব কথা হতে থাকে, যা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই মানানসই। মিথ্যা বলব না, মাঝরাতে এত একাকী লাগে! ওর ফোন পেলে

মনে হয়, ধরি। একটু গলার স্বর শুনি। কোনো কথা বলব না।

কিন্তু আমি জানি, একবার পা ফসকালে আমি পিছলে নিচে পড়তেই থাকব, পড়তেই থাকব। আমাকে টেনে তোলার কেউ থাকবে না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনিটা ইদানিং খুব মনে পড়ে। উনিও ইউসুফ ছিলেন, আর আমিও এক ইউসুফ! কত পার্থক্য আমাদের। উনি নারীর ফিতনা থেকে বাঁচতে কারাগারে চলে গিয়েছিলেন, আর আমি জীবনে কত ভুল করেছি, করেই চলেছি!

তবু যেন উনার জীবনের সাথে একটা সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পাই। ইমার জন্য তীব্র টান থাকা সত্ত্বেও ওকে এড়িয়ে চলা, ওর ঝলসানো রুপ, নজরকাড়া চোখ আর অঢেল সম্পদের লোভ থেকে নিজেকে বেঁধে রাখা, বন্ধুবান্ধব সবার চাপাচাপিকে উপেক্ষা করে, ওদের সবরকম খোঁটা সহ্য করেও প্রতিদিন শক্ত থাকার চেষ্টা করা—এই সবকিছুর জন্য আমি এই মানুষটার কাছ থেকেই প্রেরণা পাই। সায়্যিদিনা ইউসুফ যদি প্রচণ্ড চাপের মুখেও আযিযের স্ত্রী'র আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, আমি সামান্য প্রেমের আহবান উপেক্ষা করতে পারব না?

৩০ নভেম্বর ২০১২

ভাবতেও পারিনি এমন হবে! চরম দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি! আজ আমার দুঃখের দিন...

আজ সকাল থেকেই ইমার জন্য মনটা খুব আনচান করছিল। ক্লাসে গিয়ে দেখি ইমাকে অপ্সরীর মতো সুন্দর লাগছে। এত ভয়াবহ সুন্দর তার সাজ যে না তাকিয়ে উপায় নেই!

ঠোঁটে কড়া লাল রং, ফর্সা গালে গোলাপি আভা টকটক করছে। কামিজটাও কেমন যেন খুবই আকর্ষণীয়। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। ইমা আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা দিল ক্লাসের বাইরে যাবার। কি মনে করে আমিও চট করে বাইরে চলে গেলাম। আজ স্যার আসেন নি, তাই ক্লাস হচ্ছিল না। ইমা বের হয়েই আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল...

আজ সর্বনাশ হতে পারত। নফসের তাড়নায় আমিও ভুলের পথে পা বাড়িয়েই দিয়েছিলাম! খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় ভুলতে বসেছিলাম আমার এতদিনের পরিশ্রম! কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত, আমি নিজেকে তা থেকে বের করে আনতে পেরেছি। যে ভয় আমার নিজেকে নিয়ে ছিল, আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে রক্ষা করেছেন!

আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলে ইমা খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক কান্নাকাটি করে। ইমা চেয়েছিল আমি যেন ওর রূপের কাছে হার মানি, এরপর বিয়ে করতে বাধ্য হই। নাছোড়বান্দা ইমা। কিন্তু না, আমার পক্ষে ইমাকে এভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না। নবী ইউসুফ পেরেছিলেন, আল্লাহ আমাকেও সাহায্য করেছেন। আজ একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম—ইমার সাথে একই ক্লাসে থেকে ফিতনায় জড়ানোর চাইতে বরং পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়াই আমার জন্য উত্তম হবে।

০৭ মার্চ ২০১৩

অনেক কষ্ট করে নিজে নিজে পড়েই পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার আগের খুব জরুরি সব ক্লাসই মিস দিয়েছি। ইমার কথা ভেবে, নিজের কথা ভেবে নিজেকে দূরে রাখাই শ্রেয় মনে হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ রেজাল্ট বরাবরের মতোই ভালো এসেছে। আল্লাহর কথা ভেবে কিছু ছাড়লে আল্লাহ তার চাইতেও উত্তম কিছু মানুষকে দেবেনই। গত সপ্তাহে চাকরির জন্য কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েছি। যে ফলাফল এসেছে, তাতে আশা করি চাকরি আটকাবে না ইনশা আল্লাহ।

কিন্তু ইমার সাথে সুন্দর একটা সংসারের স্বপ্ন ছিল, সেটা বোধ হয় আর হবে না। ইমা আজকাল আরেকটা ছেলের সাথে ঘোরে, কদিনেই বেশ অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনে হয়। কষ্ট লাগে, খুব কষ্ট লাগে। আমার ইমা আর আমার নেই! মাঝে মাঝে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, তাহলে কেন এতদিন আমার সাথে ছিলে? কেন আমাকে পাওয়ার জন্য এত্তো মরিয়া হয়ে আমার জীবনটা কঠিন করে দিলে? কীভাবে পারলে এত সহজে আরেকজনের সাথে সম্পর্ককরতে?

কিন্তু করা হয় না। বেশি খারাপ লাগলে রেহানের রুমে চলে যাই, গভীর রাত পর্যন্ত কথা হয়। ইমার কথা, দ্বীনের কথা, আখিরাতের কথা। তখন একরকম খুশিও হই। ইমা আমার ছিলই বা কবে! আমার জন্য ইমা না। আমি ইমাকে আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিনিময়ে উত্তম কাউকেই আমার জন্য রেখেছেন যে শুধু এই জীবনে না, ওপারের জীবনেও আমার স্ত্রী হবে। আমার জান্নাতী স্ত্রী! আমি মনেপ্রাণে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি.....।

"হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।" [২৫:৭৪]

৫

একনাগাড়ে এতটুকুপড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। চোখ পানিতে ভিজে গেছে। মনে অপরাধবোধ কাজ করছে। ইউসুফ কেন আমাকে এসব কথা বলে নি এখন বুঝতে পারছি। অতীতের গুনাহর কথা জানিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহ সৃষ্টি করা ছাড়া তো কোনো লাভ নেই। তাছাড়াও ওই জীবনকে অনেক আগেই পেছনে ফেলে এসেছে। এখন ও শুধু আমাকেই ভালোবাসে।

নিজের হাতে ডায়েরির পাতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলাম, এরপর আগুন ধরিয়ে দিলাম। অতীতের গুনাহর সাক্ষী রাখার কোনো মানে নেই। কাগজগুলোয় লকলক করে আগুনের শিখারা জ্বলছে – পুড়ে যাক সব কাগজ, পুড়ে যাক বীভৎস সব স্মৃতি।

ঘরে ঢুকে দেখি ইউসুফ অগোছালো বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কী নিষ্পাপ মায়াময় একটা চেহারা! মাথার নিচের বালিশটা ভেজা, আমি কেঁদেছি, সেও কেঁদেছে। কী পরিমাণ সংগ্রামই না করেছে মানুষটা আল্লাহর পথে চলার জন্য!

যুবতী নারীর ডাকে সাড়া না দেওয়া একজন পুরুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার! সেই সাথে বন্ধুবান্ধবের জোরাজুরি, পিয়ার-প্রেশার, অঢেল সম্পদের মোহ ত্যাগ করা! এরপর ভালোবাসার মানুষকে পর হয়ে যেতে দেখা! সেটাও কী সম্ভব!

কত রাগ ছিল আমার মনে, কত প্রশ্ন, কত কৌতূহল। ঠিক করলাম সেসব কিছু প্রকাশ করে এই ভাঙা অন্তরটাকে আর বিব্রত করব না।

আল্লাহ তা'আলা এই মানুষটার ত্যাগের বিনিময়ে আমাকে স্ত্রী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যেন আমি মানুষটার মনের যত্ন নিই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সংগ্রামী মানুষটার যোগ্য ভেবেছেন, কী করে তাকে কষ্ট দিই! অনেক মমতায় ঘুমন্ত মানুষটার মাথা বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

এত মমতা বোধ হয় শুধু স্বামী-স্ত্রী'র মাঝেই সম্ভব।

একমাত্র আল্লাহই পারেন স্বামী-স্ত্রী' র মাঝে এই গভীর ভালোবাসা ঢেলে দিতে.....